রুখমাবাঈ কেস

ঊনিশ শতকের বিধবা বিবাহের সূচনা (১৮৫৬সাল) বাংলায় বিবাহের সম্পর্কের নতুন দিককে উন্মোচিত করেছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ সম্পর্কিত এই আইনটি স্বামীর মৃত্যুর পরও সেই সম্পর্ককে অব্যাহত রাখার প্রথার অবসান ঘটিয়েছিল। ১৮৭২ সালে নেটিভ অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজ বিবাহকে পবিত্রতার বন্ধন থেকে চুক্তির পর্যায়ে উন্নীত করতে প্রয়াসী হয়েছিল। এই আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টি উল্লেখিত ছিল। পরে দেখা যায় ১৮৬৯ সালে ডিভোর্স অ্যাক্ট ও ১৮৭২ সালে নেটিভ অ্যাক্টের দ্বারা বাংলায় প্রচুর মহিলারা বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিলেন। ঔপনিবেশিক যুগে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানকে প্রথম চ্যালেঞ্জ করে বিবাহ বিচ্ছেদের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছিলেন রুখমাবাঈ। তাঁর ঘটনাটি এখানে আলোচনা করা হল।

রুখমাবাঈ (Rukhmabai) কে এগারো বছর বয়সে দাদাজী ভিকাজীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে দাদাজীর মায়ের মৃত্যু হয়। দাদাজী রুখমাবাঈকে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসার জন্য দাবী করেন। কিন্তু রুখমাবাঈ শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে অস্বীকার করেন। সখারাম (তাঁর মায়ের দ্বিতীয় স্বামী) তাঁর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। ফলে দাদাজী ১৮৮৪ সাল নাগাদ 'রেস্টিটিউশন অফ কনজুগ্যাল রাইটস' এর জন্য মামলা করেছিলেন। কিন্তু বিচারক রবার্ট হিল ফিনে (Robert Hil Phiney) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন যে ইংল্যান্ডে এই আইন যে পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ যথেষ্ট প্রাপ্ত বয়স্ক হলে এই মামলা করা যায় কিন্তু ভারতের হিন্দু আইনে সেটিকে অন্তর্ভুক্তি করা সম্ভব নয়। বিচারক উল্লেখ করেন যে রুখমাবাঈয়ের যখন বিবাহ হয়েছিল তখন তাঁর অল্প বয়স ছিল কিন্তু এখন দাদাজী প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাকে একসঙ্গে থাকার জন্য জোর করতে পারে না। বিচারকের সিদ্ধান্তের নানা সমালোচনা হতে থাকে। বিচারক ফিনের অবসর প্রাপ্তির পর এই মামলার পুনর্বিচার হয়। তিলক 'মারহাট্টা' পত্রিকায় এই ঘটনার সমালোচনা করেছিলেন কারণ তাঁর মতে বিচারক ফিনে (Phiney)হিন্দু আইনের বিষয়টি অনুধাবন না করে বিবাহের বিষয়টি সংস্কারের জন্য বক্তব্য রেখেছিলেন। ফলে হিন্দু ঐতিহ্য ও ইংরেজী আইনটির মধ্যে কোনটি অধিক গ্রহণীয় তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ১৮৮৬ সালের ১৮ মার্চ প্রথম মামলার বিরুদ্ধে আপিল করা হয়। এটি সহবিচার ও বিচারকের দায়িত্বে যায়। ১৮৮৭ সালের ৪ঠা মার্চ হিন্দু আইনের ঐতিহ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে রুখমাবাঈকে (Rukhmabai)তার স্বামী দাদাজীর কাছে গিয়ে থাকতে হবে না হলে ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। রুখমাবাঈ সাহসিকতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি সর্বাধিক শাস্তি পেতে রাজি তবু এই আদেশে মানবেন না। এর ফলে বিতর্ক আবার শুরু হয়েছিল। তিলক 'কেশরী' পত্রিকায় লিখেছিলেন যে রুখমাবাঈ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তিলক এটিও উল্লেখ করেছিলেন যে হিন্দু জাতির সম্মুখে ঘর বিপদ। ম্যাক্সমুলারের মতে আইন সর্বদা সব সমস্যার সমাধান হতে পারে না যা রুখমাবাঈয়ের ঘটনা থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব। এপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে রুখমাবাঈয়ের শিক্ষা তাঁর নিজস্ব মতামত প্রদানের ক্ষেত্রকে তৈরী করেছিল। শেষে সমাজ সংস্কারকদের বিভিন্ন সভায় প্রচারের দ্বারা ও রানী ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে বিষয়টির সমাধান হয় ও রুখমা বাঈয়ের পক্ষে সিদ্ধান্ত যায়। এ প্রসঙ্গে তনিকা সরকার উল্লেখ করেছেন যে, The issue foregrounded very forcefully the problems of consent and indissolubility within Hindu Marriage.

রুখমাবাঈয়ের ঘটনা চিরাচরিত ঐতিহ্যপূর্ণ বৈবাহিক সম্পর্ককে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল। মেয়েরা স্বামীর ব্যভিচারের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে কিনা এ বিষয়টি নিয়ে তর্ক বিতর্ক শুরু হয়েছিল। দৈনিক সমাচার-চন্দ্রিকায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছিল যে, "Among the Hindus, unchasty on the part of the husband is certainly capable offence but they set much higher value upon female chastity." সমসাময়িক পত্রিকা ধূমকেতুতে ১৮৮৭ সালের ৪ঠা জুলাই রুখমাবাঈয়ের ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছিল যে এটি খুবই বিস্ময়কর যে একটি সাধারণ মেয়ে সমগ্র হিন্দু সমাজের জাতির ঐতিহ্যের ভিতকে আলোড়িত করেছিল। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে এই ঘটনা শুধু হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করেনি সমগ্র অষ্টাদশ শতকের জুড়ে ঔপনিবেশিক শাসকরা যে হিন্দু ঐতিহ্য অনুযায়ী এক সংঘবদ্ধ আইন প্রণয়ণ করার অছিলায় যে ব্রিটিশ আইনকে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। সেটিরও দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। এই সংগঠিত আইন হিন্দু পারিবারিক সম্পর্ক কে নতুনভাবে সংঘঠিত করেছিল। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে এই সংঘবদ্ধ আইন আঞ্চলিক ভেদে ঐতিহ্যকারী প্রথাগুলির উপরে শুধু আঘাত হানেনি মহিলাদের আবস্থানক প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল। এই নব্য আইন মহিলাদের যৌন সম্পর্কের উপর কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা আরোপ করেছিল। হিন্দুদের অঞ্চল ভেদে গতানুগতিক প্রথা (Customary) অনুযায়ী নিম্ন শ্রেণীর মধ্য বিবাহ বিছেদ, বিধবা বিবাহ,ইতাদি খুব স্বাভাবিক ছিল যার দরুন রুখমাবাঈ(নিম্নশ্রেণী) বিবাহ বিছেদের বিষয়টি উত্থাপিত করতে পেরেছিলেন কারন এটি তাদের খুবই সহজ প্রথা ছিল।

ঔপনিবেশিক যুগে হিন্দু আইনের সংবদ্ধতার দরুন তার পরিবর্তে হিন্দুমহিলার আদর্শ হয় পতিব্রতা, সতীত্ব, স্বামীর প্রতি আনুগত্যপূর্ণ আচরণ ইত্যাদি। এমনকি মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার ও স্ত্রীধনের ধারনার পরিবর্তন ঘটে। যেমন মিতাক্ষরে উল্লেখ আছে স্ত্রীধন উত্তরাধিকার সুত্রে মহিলারা পাবে কিন্তু গোঁটা ঊনিশ শতকের বিচারে এবিষয়টি গোপন রাখা হয়। এবং ১৯২২ সালে প্রিভি কাউন্সিলে এই বিষয়টি বাতিল করা হয়। এই নতুন আইনের দরুন মহিলারা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। সুতরাং একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক আইন ও হিন্দু ঐতিহ্যপূর্ণ আইনের এই বৈষম্যের বিষয়টি রকমাবাঈএর ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল আবার এর সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে এক যথার্থ উপযুক্ত হিন্দু আইনের প্রয়োজনীয়তার দিকটি ক্রমশ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল। বিশেষত বাংলায় এই সময়ে বহু মহিলারা বিবাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ধর্মান্তরিত করনের সাহায্য নেওয়ার দরুন বিবাহ বিচ্ছেদর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রটি আরও ত্বরান্বিত হয়েছিল।

নোটঃ সম্পাদিত এই অংশটি অধ্যাপিকা মিতালী দের প্রবন্ধ '*বিংশ শতকে বিবাহবিচ্ছেদ ধারার প্রণয়ন ও বাংলার মহিলা*' থেকে নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপিকা দে'র এই প্রবন্ধটি 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' জার্নালের আন্তর্জাতিক সংখ্যা ২০১৯তে প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকার কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

প্রশ্নঃ

১. রুখমা বাঈয়ের বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনি লড়াইয়ের তাৎপর্য আলোচনা কর ।

২. রুখমা বাঈয়ের বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনি লড়াইয়ের প্রতিক্রীয়া কি হয়েছিল ?